স্মরণিকা

উত্তর পূর্ব ভারত হিন্দু মিলন মন্দির সম্মেলন

খারুপেটিয়া ঃঃ দরং ঃঃ অসম

১৫,১৬,১৭ ডিসেম্বর ২০১৪

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ

সম্পাদক
ড° পরিমল কুমার দত্ত

খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির

মা কামাক্ষার লীলাভূমি এই অসমের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেক পুরানো। নীলাচল পাহাড় যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ কামাক্ষা ক্ষেত্র অবস্থিত সেখানে থেকে বেশি দূর নয় অসমের দরং জেলার খারুপেটিয়া নগর । স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যবসায়ের সূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাগ্যসন্ধানী ব্যবসায়ীরা আসতে আরম্ভ করেছিলেন। চারদিকে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলোর কৃষিজীবীদের সম্পর্ক স্থাপিত হল এই খারুপেটিয়া শহরের অধিবাসীদের সাথে। ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠল। একদিন জাহাজে করে মাল আমদানি রপ্তানি করা হত। ব্রহ্মপুত্র নদ ক্রমে সরে যাওয়াতে জাহাজঘাটও ইতিহাসের পাতায় চলে গেল । খারুপেটিয়া ঘাট এখন খারুপেটিয়া নামেই পরিচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের আগমনের ফলে গড়ে উঠল সেই নিজের নিজের সম্প্রদায়ের উপাসনা মন্দির। নিজের নিজের ইষ্ট দেবতার নামে সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়ে উঠল। সমস্ত হিন্দু একত্র হয়ে উপাসনা করার মত কোনো উপাসনা মন্দির কিন্তু গড়ে উঠেনি। শিবাবতার প্রণবানন্দ মহারাজজির ঐশী নির্দেশেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে খড়্গ মহারাজ। তিনি ঠাকুরের নির্দেশে হিন্দু মিলন মন্দিরের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন । তারপর থেকে একের পর এক এসেছেন অনেক স্বামীজি। তখনও কিন্তু হিন্দু মিলন মন্দিরের কোনো সংগঠন খারুপেটিয়াতে গড়ে উঠেনি। চারণদল বেশ কয়েক বার এসে প্রচার করেছেন । যজ্ঞও করেছেন এবং প্রধান স্বামীজিরা দীক্ষাও দিয়েছেন । দীক্ষার্থীরা সংখ্যা প্রতি বছরেই বাড়তে লাগল। অবশেষে ১৯৯২ সালে বর্তমানে মাতৃমণ্ডলীর অহবায়িকা শ্রী মতী শিপ্রা চক্রবর্তীর বাড়িতে জন্ম হল খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির। উপদেষ্টা হলেন ধীরেন্দ্র কুমার রায় ও অমলেন্দু বিকাশ দাস। সভাপতি - বিনয় ভূষণ দাস। সম্পাদক - প্রণব চক্রবর্তী। কয়েকবছর পরে সভাপতি ও সম্পাদক পদে আসীন হলেন যথাক্রমে প্রণব চক্রবর্তী ও অজিত সাহা। অজিত বাবু সম্পাদক হওয়ার পর থেকেই মিলন মন্দিরের কাজে গতি এল। কার্য্য পদ্ধতির উন্নতি ঘটল। তখন আমাদের বসার কোনো জায়গা ছিল না, না ছিল নিজস্ব কোনো উপাসনা স্থল। চারণদল প্রতিবছরেই আসতে আরম্ভ করল। কখনও তেরাপন্থ ভবন কখনও রাইসমিল (বর্তমান সারদা নগর) আবার কখনও বারোয়ারী দুর্গামন্দিরে কখনও বা টাইগার ক্লাবে অনুষ্ঠান গুলো সম্পাদিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান গুলোর কাছে আমরা চিরঋণী। আমাদের অতি উৎসাহী কয়েকজন যুবক এগিয়ে এলেন। বর্তমান টাউন ফিল্ডের পূর্ব সীমান্তে প্রায় ২ বিঘা জায়গা দখল করা হল। মুখ্য মন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার সুপারিশ নিয়ে আসা হল। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ আনার কৃতিত্ব বাদল সাহা (গোপাল নগর) মহাশয়ের । ল্যান্ড এড্ভাইসার বোর্ড এই জায়গা আমাদের নামে আবন্টন দেওয়ার সময় কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক বাধা সৃষ্টি করল। আমরা জায়গাটা পেলাম না কিন্তু মাটিটা আমাদের দখলে ছিল। টাউন ফিল্ডটা ষ্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা নেওয়ায় আমরা জায়গাটা ছেড়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ২০০২ সনে নতুনপট্টিতে এক টুকরা জমি কেনা হল। কিন্তু জমিটা পাশে কম থাকায় সবার পছন্দ হল না। এই সময়েই ২ নং ওয়ার্ডে এক বিঘা মাটি আমরা কেনার চেষ্টা করলাম। ধার দেনা করে অবশেষে ২ লাখ টাকায় এক বিঘা মাটি কেনা হল। মাটি কেনার জন্য যারা সেই সময় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ নাথ সাহা, নিমাই সাহার নাম উল্লেখ না করে পারছি না। এরমধ্যে আমাদের সবার প্রিয় নীরেন দা কে আমরা হারালাম। নীরেন বাবুর মৃত্যুর পরে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি আমি। সেই অজিত বাবু তখন সম্পাদক ছিলেন। এই সময়েই খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের নিজস্ব জায়গা হল। অর্থের অভাবে রেজেষ্ট্রি ফিস বাঁচানোর জন্য দান সত্র হিসাবে জমিটা নেওয়া হল ।

আমরা যখন অর্থ সংগ্রহের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ঠিক সেই সময়েই ঠাকুর আমাদের কাছে পাঠালেন এক মহীয়সী নারীকে। উদার হৃদয় স্বল্পভাষী নিরহংকারী পরোপকারী ভারতসরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মাতৃদেবী বিশাল হৃদয় নিয়ে এগিয়ে এলেন। জমির মূল্য ২ লাখ টাকাতো দিলেনই তার উপর সিমেন্ট, রডও দিলেন । এই মহীয়সী নারী টাকার অঙ্কে প্রায় ২০ লাখ টাকা দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা খারুপেটিয়া কেন এই দেশে বিরল। এখনও তিনি আমাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। ধন্য এই মহীয়সী নারী ও তাঁর পুত্র । ধন্য আমরা খারুপেটিয়া বাসীগণ। খারুপেটিয়ার অবিসংবাদী নেতা এই শহরের প্রথম রূপকার খারুপেটিয়ার নগর সমিতির প্রথম নির্বাচিত সভাপতি রাম নারায়ণ রায় চৌধুরীর ধর্ম পত্নী প্রতিভা নারায়ণ রায় চৌধুরী ও একমাত্র পুত্র দীপক রায় চৌধুরীর অবিস্মরণীয় অবদানে খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির আজকের পর্য্যায়ে উপনীত হতে পেরেছে। দীপক বাবু বাদেও অনেকেই আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন বা করছেন।

আমার পর সভাপতি হলেন সুরেশ সুরানা। সুরেশ বাবুর পর হলেন সভাপতি আনন্দ সাহা। আমাদের মন্দিরের শিলান্যাস এর মধ্যে হয়ে গেল। মন্দির নির্মাণ কাজেও অর্থ নিয়ে এগিয়ে এলেন স্বয়ং সাধনানন্দ (মধু) মহারাজজি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এই স্বামীজির সম্পর্কে লিখতে গেলে অভিধানে বিশেষণ পদ খুঁজে পাইনা। কর্মবীর বাগ্মী তেজস্বী উৎসাহদাতা অনুপ্রেরণাকারী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন এই সাধনানন্দ মহারাজজি আমাদের কাছে বার বার ছুটে এসেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। অজিত বাবু ছিলেন দূরদর্শী সৎ এবং অধ্যবসায়ী ব্যক্তি। অসম্ভব কে সম্ভব করে তোলায় পারদর্শী। নতুন পট্টি জায়গা বিক্রী করা হল। এখানেই নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুললেন এক বিশাল মন্দিরের কাঠামো। সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল, অর্থসংগ্রহ করার মধ্যে দক্ষতা ছিল। নিজেই ইঞ্জিনিয়ার, নিজেই রাজমিস্ত্রি, নিজেই যেন যোগানদার। দিন রাত একই ধ্যান মন্দির! মন্দির,! মন্দির। তিনি নিজে ছিলেন কুলগুরুর দীক্ষিত।

আনন্দবাবু অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী। তিনি আমাদের যোগ্য কাণ্ডারী। তাঁর সাহসেই আমরা চতুর্দশতম দ্বিবার্ষিক উত্তরপূর্ব ভারত হিন্দুমিলন মন্দির সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছি। কিন্তু ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজির কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া যেকোনো শিষ্যের চেয়ে এই কুলগুরু দীক্ষিত দুই জনেই অনেক বেশি ঠাকুরের প্রিয়। ঠাকুরের বিধানেই খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা। দুই তলার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ঠাকুর নিয়ে গেলেন মর্ত্যলোক থেকে তাঁর আদরের সন্তান অজিত বাবুকে। ইতিমধ্যে আমরা হারালাম আমাদের ২৪ ঘন্টার কর্মী মনীন্দ্র পালকে। মন্দির নির্মাণে বাধা এসেছে বহু। তারই মধ্যে আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী ও কর্ণধারকে হারিয়েছি। অর্থ ও সাহস দিয়ে যিনি সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন সেই আমাদের বড় ভরসা প্রমথ নাথ সাহা (হরিবাবু)ও চলে গেলেন পরলোকে আমাদের সবাইকে ছেড়ে।

হিন্দুমিলন মন্দির সমিতির প্রতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা যিনি মন্দির শিলন্যাসের সময় উপস্থিত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ছিলেন, যিনি আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলন সেই আমাদের আরেক দানবীর ধীরেন্দ্র কুমার মহাশয় আমাদের ছেড়ে পরলোকে চলে গেলেন।

প্রথম নাথ বাবু, ধীরেনবাবু ও অজিত বাবু আজ জীবিত থাকলে আমাদের অনেক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হত। এই মন্দিরের উদ্বোধন অনেক আগেই হয়ে যেত। ঠাকুর চেয়েছিলেন সমস্ত হিন্দু যেন একই জায়গায় মিলিত হতে পারে।

খারুপেটিয়া হিন্দুমিলন মন্দিরের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে কুলগুরু দীক্ষিত, সৎসঙ্গী, রামকৃষ্ণ মিশনের অনুগামী স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য, প্রভু জগৎ বন্ধুর শিষ্যদের নিয়ে। মন্দিরের কাজ নিরন্তর দেখা শোনা করেছেন প্রবীর সাহা (রামু) ও বিমল বসাক। এই বিমল বাবু নিজে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শিষ্য। সৎসঙগী হয়েও ২৪ ঘন্টা মন্দিরের চিন্তা ও কাজ করে থাকেন। আর প্রবীর (রামু) বাবুর নিজের ও পরিবারের অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের কোষাধ্যক্ষ ফণী সাহা একজন সৎ ও শৃঙ্খলা পরায়ণ ব্যক্তি। হিন্দু মিলন মন্দির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধান কার্য্যালয় থেকে আমাদের আয়ব্যয়ের হিসাবের প্রশংসা করা হয় । মাতৃমণ্ডলীর আহবায়িকা শিপ্রা চক্রবর্তী সক্রিয়া ভদ্রমহিলা। মাতৃ মণ্ডলীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তরুণ শিষ্য ও ভক্তগণও যথাসাধ্য সহযোগিতা করে থাকেন। খারুপেটিয়ার সর্বস্তরের জনগণ আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির মাননীয় সাংসদ শ্রী যুক্ত নারায়ণ বরকটকী তাঁর এম.পি ল্যাড্ ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। যদিও পুরো টাকা আমরা পাই নি। দঁলগাও বিধান সভা সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় শ্রী যুক্ত ইলিয়াস আলি মহোদয় প্রাচীর নির্মাণের জন্য তাঁর সমষ্টি উন্নয়ন তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এব্যাপারে কোনো অর্থ খরচ হয়নি। মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির বর্তমান সাংসদ মাননীয় শ্রী যুক্ত রমেন ডেকা মহোদয় তার এম্. পি. ল্যাড থেকে একটি ভাণ্ডার ঘর নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকার অনুদান দিয়েছেন। খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরে

এই সদাশয় ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগতিা না থাকলে মন্দির নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। খ্যাত-অখ্যাত, সবাক-নির্বাক, সরব-নীরব বহু মানুষের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক সহযোগিতায় এই মন্দির বর্তমানের রূপ পেয়েছে।

খারুপেটিয়ার হিন্দু মিলন মন্দির আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হলেও গরিব মেয়েদের বিয়ে, দুঃস্থদের চিকিৎসা ও গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করেছে ও ভবিষ্যতেও করে থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে টেষ্ট পেপার করে থাকে।

দুর্গাপুজোর বির্সজনের সময় ভক্তদের মধ্যে বিশুদ্ধ জল ও বাতাসা বিতরণের দায়িত্ব খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির যথাসাধ্য পালন করেছে। প্রতি বৎসর গরিবদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

কয়েক বছর আগে দরং ও ওদালগুরি জেলায় গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল। খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির থেকে ৫৩ টা শরণার্থী শিবিরের জানি-ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে শরণার্থীদের কম্বল ও মশারী দেওয়া হয়েছিল।

প্রাণায়াম ও যোগের জনপ্রিয়তার আগেই খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির যৌগিক চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে ৮০০ রোগী জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে চিকিৎসা করেছিল। টাইগার ক্লাবে প্রণবানন্দ কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে খারুপেটিয়াতে সর্বপ্রথম কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ মহারাজজির মন্দিরকে কেন্দ্র করে আমরা এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইংরাজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়, গোশালা, বালিকা মহাবিদ্যালয়, যৌগিক হাসপাতাল, উপজাতি ছাত্রাবাস ও বৃদ্ধাশ্রম।

আমাদের জায়গা অনেক কম, মন্দির সংলগ্ন মাটির মালিকদের কাছে আমরা প্রর্থনা জানিয়েছি। আমাদের স্বল্প পরিমাণ মাটি যেন প্রত্যেকেই মহান যজ্ঞের জন্য দান করেন। অনেকেই রাজি হয়েছেন। ২/১ জন এখনও মত দেননি। আমরা আশাবাদী। এ সমস্যাও মিটে যাবে।

আমাদের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আসামের মানচিত্রে খারুপেটিয়া এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে।

বর্তমান প্রজন্মের সমস্ত যুবক-যুবতী, বৃহত্তর খারুপেটিয়ার ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতি এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের আবেদন-

আপনারা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসুন -

কবিগুরু ভাষায় -

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারত মাতারই অভিন্ন ক্ষুদ্র রূপ খারুপেটিয়া মাতার অভিষেকে অপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির দীক্ষিত-অদীক্ষিতের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সবাইকে নিয়েই এগিয়ে চলছে, এগিয়ে যাবে।

'চরৈবেতি চরৈবেতি।'

ড° পরিমল কুমার দত্ত
এম্.এ. (ট্রিপল্),
এম্.এড্, পি.এইচ্.ডি.
খারুপেটিয়া

জীবন যেখানে জীবনের কথা শোনায় সেইতো খাড়ুপেটিয়া

"কারা আজ হেঁটে যায়
এই ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে,
সারাদিন সারারাত !
কারা কান পেতে শোনে
কল্লোলিনী জন্মভূমির কলতান ?
কারা আজ বালুচরি খেত্রেশ্বরে
দ্রৌপদীর হারানো খাড়ু
আর শঙ্করগুরুর পদচিহ্ন
খুঁজে ফেরে ?"

(জন্মভূমির কথামালা)

আমার ও আরও অনেকের সাধের জন্মভূমি বর্তমান খারুপেটিয়া শহর, দরং জেলার এক বাণিজ্য নগরী, অর্ধেক অসমবাসীকে তার পশ্চাদ্‌ভূমির কৃষিজাত পণ্য খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে প্রায় একশতক কাল ধরে। একথা বর্তমানে অসমবাসী মানুষের কারও অজানা নেই। কয়েক বছর পূর্বে অসমের প্রথিতযশা কবি নীলিমকুমার (তিনি সেসময় খারুপেটিয়া সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ শাখার চিকিৎসকরূপে কর্মরত ছিলেন)। একটি সুন্দর কবিতায় খারুপেটিয়ার সেই অন্নদাতা রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে 'খারুপেটিয়ার কবিতা' শীর্ষক কবিতা থেকে প্রথম স্তবকটি নীচে অবিকলরূপে পাঠকদের উপহার দেওয়া হল ঃ

"পানীর পরা তুলি আনি
র'দত মেলি দিয়া মরাপাটর চুলিতেই
লাগি থাকে
পৃথিবীর আটাইতকৈ বেছি মাটির গোন্ধ
এই কথা মই নাজানিছিলো
তালৈ যোয়ার আগতে।
দেখা নাছিলো জোনাকর ইমান খেলা
ইমান আনন্দ তালৈ যোয়ার আগতে।
দেখা নাছিলো বেঙেনাবোর যে
ঘন নীলা হৈ যায় রাতির জোনাকত
শাক পাচলির যে রং সলায় রূপালী পোহরত
পথার পথার বিলাহী
পথার পথার ফুলকবি বন্ধাকবি
আরু লাও কোমোরার বাগানর ওপরত
সিঁচি দিবলৈ যেন ইয়াত
আকাশর কম হৈ যায় জোনাক।"

এককালে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বয়ে যেত কুলু কুলু শব্দে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র। প্রকৃতির কোনও এক নির্মম বিরাগে ব্রহ্মপুত্র তার গতিপথ পাল্টিয়ে ফেলে পাঁচের দশকের অন্তিম পর্বে। কিন্তু খারুপেটিয়া তাকে ভোলেনি, ধরে রেখেছে অশোকাষ্টমীর স্নান মেলা। একটি জলাশয় নির্মাণ করে সে-স্নান আজও চলছে। যেন জলাশয়টি ব্রহ্মপুত্রের ভৌগোলিক অস্তিত্বের স্মারক। সে স্নানের মেলা উপলক্ষে সমবেত পুণ্যকামী স্নানার্থীদের উদ্দেশে নীরব ভাষায় বলছে-'শুনুন, এই এখানটায় একদিন ব্রহ্মপুত্র ছিল আমি তার সাক্ষী।'

শহরটি গুয়াহাটি থেকে প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরবর্তী, দরং জেলার সদর মঙ্গলদৈ থেকে মাত্র বাসে কুড়ি মিনিটের পথ। থানা খারুপেটিয়া, মহকুমা - মঙ্গলদৈ, ৫২ নং রাষ্ট্রীয় মহাসড়ক চলে গেছে এর কবুতরী বুক দিয়ে এঁকে-বেঁকে দলগাঁও, বেটিমারী, লালপুল, রৌতা, ঢেকিয়াজুলি, ঠেলামারা, তেজপুর অতিক্রম করে আরও বহুদূর। আজ খারুপেটিয়া যেমন অসমের ইতিহাস ভূগোলে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী সেকালেও এখানে একটি স্টিমার ঘাট থাকায় ভূগোল-ইতিহাসে আদৌ অনামী ছিল না সে।

কেন আমাদের জন্মভূমি শহরটির নাম খারুপেটিয়া সে নিয়েও কম বিতর্ক নেই। লিখিত তথ্যপাতি পাওয়া যায় না। সম্ভবত অসমের ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে যখন নিয়মিত জাহাজ চলাচলের সূচনা হয়, ঠিক একই সময়ে এখানেও একটি জাহাজ ঘাট স্থাপিত হয়ে থাকবে। স্টিমার কোম্পানিতে প্রাপ্ত পুরোনো নথিপত্রে ১৮৯৬ সনে খারুপেটিয়া জাহাজঘাটের অস্তিত্বের নিদর্শন মেলে। আমার ছোটবেলায় অর্থাৎ পাঁচের দশকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই ঘাটটিকে কয়লাঘাট বলে উল্লেখ করতেন। তাতে মনে হয় জাহাজ বা স্টিমারের জ্বালানি অর্থাৎ